দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা বিতর্ক রচনা: একটি সাধারণ আলোচনা

সাহিত্য হল সময়ের দলিল। তাই যে সময় সাহিত্য রচনার প্রেক্ষাপট তৈরি করে, সাহিত্যিকদের কলমে সেই সময়ের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অবস্থায় যুগগত বৈশিষ্ট্যই ফুঁটে উঠে। তাইতো সাহিত্যকে বলা হয় যুগের দর্পণ, সময়ের দলিল। বিতর্ক মুলক রচনার প্রেক্ষিতেও একথা বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। মূলত সমাজিক ও রাষ্ট্রিক পটভূমির উপর ভিত্তি করে তর্ক বিতর্ক রচিত হয় বলেই এধরণের রচনাকে বিতর্ক মূলক রচনা বলা হয়েছে।

মানব সমাজে যুগবিভাজনের রীতি নির্ধারিত হয় মূলত রাষ্ট্রিয় সামাজিক ধ্যানধারনার উপর ভিত্তি করে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সূচক ধরেই। যুগ বিভাগের এই রীতি নিঃসন্দেহে বিজ্ঞান ভিত্তিক। একেকটা যুগ একেকটা মানসিকতার পরিচায়ক। তবে আমরা জোর করে বলতে পারি না যে একটি মাত্র ঘটনার পরিসর নির্দিষ্ট গাণিতিক অঙ্কের নিয়মে একটি যুগ বা যুগসীমা নির্ধারন করে। পূর্ববর্তী যুগের স্থবিরতাকে আঘাত করেই নতুন একটি যুগের শুরু হয়। মোটকথা হল প্রতিটি যুগের সুচনা হয় রাষ্ট্রিক সামাজিক ঝড় ঝাপটাকে আত্তীকরন করেই আর এই ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ অবস্থার পটভূমিতেই রচিত হয় বিতর্ক রচনা। ভারতবর্ষে বিতর্ক মূলক রচনার সুত্রপাত উনিশ শতকীয় ভাবদ্বন্দ্বময় জটিল ঘূর্নাবর্তের সময়ে, নবজাগরনের মঙ্গলদ্বীপের আলোক ছটা দিয়ে। উনিশ শতকীয় সমসময়িকতার মাপকাঠিতেই বাংলার প্রগতিশীলদের মূল্যায়ন করা উচিত বলে আমরা মনে করি।

ভারতবর্ষে রেনেসা বা নবজাগরনের সূচনা হয়, কলকাতা নগরীর পত্তন এবং ব্রিটিশ উপনিবেশের ফলে আমাদের দেশে যে ইংরেজি শিক্ষার সূত্রপাত ও বিস্তার ঘটে তারই সূত্র ধরে। আর এই নবজাগরনের ভালো দিক গুলোকে অনেকেই মানতে পেরেছেন আবার অনেকেই মানতে পারেন নি। ফলে শুরু হয় নবীন বনাম প্রবীন, প্রগতি বনাম পরাগতি বা রক্ষণশীলতা বনাম প্রগতিশীলতার দ্বন্দ্ব। আর এই ভাব দ্বন্দ্ব সংকুলতার ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়েই বিতর্ক মূলক সাহিত্য রচনার উদ্ভব বা ক্রমবিকাশ।

পাশ্চাত্য শিক্ষা সাহিত্য শাসন ইত্যাদি বিষয়গুলি উনিশ শতকীয় বাংলার সামাজিক রাজনৈতিক, শৈক্ষিক, ধর্মীয় সমস্ত ক্ষেত্রেই এক জটিল ভাবদ্বন্দ্বের জন্ম দিয়েছিল। ভিন্ন মত ভিন্ন পথের কারণে মানুষের জীবন যাপনের সর্বক্ষেত্রে এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। এই দ্বান্দ্বিক পাটভূমিতেই ভিন্ন ভিন্ন দল, মত সংঘ প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হল এই সময়েই। এই সকল মত ও দলের মধ্যে মত এবং পথের মিল অমিল উভয়ই ছিল। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম মতের বিচিত্রতা, সামাজিক আচার নিয়মের রীতি নীতি এবং অন্ধতা, শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা, রাজনৈতিক বিধি নিষেধ ইত্যাদি ছিল বিতর্ক রচনার প্রধান বিষয়। ব্যক্তি বনাম ব্যক্তি, সংগটন বনাম সংগটন, পত্রিকা বনাম পত্রিকাতে মতামতের লড়াই ব্যাপক ভাবে চলছিল গোটা উনিশ শতক ধরে। ভিন্ন ভিন্ন বিষয় মতবাদ নিয়ে এযুগের সমাজ সংস্কারকগন কলম ধরেছিলেন নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠা করার জন্য। বিতর্ক বা পলিমিককে বলা হয়েছে-

> "The art and practice of argumentation, controversy; debate; ....."[১]

সরাসরি কারো মতামতকে মান্য না করেও আবার কোনও কোনও সময় মান্যতা দিয়েও অনেকেই ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করে অনেক পুস্তক রচনা করেছেন। গদ্যভাষার যেহেতু বহন ক্ষমতা বেশী এবং সংযোগের উপযুক্ত মাধ্যম তাই তর্ক বিতর্ক রচনাগুলি গদ্যভাষাতেই রচিত হয়ে থাকে। উপযুক্ত সামাজিক পটভূমি এবং গদ্যভাষা ব্যতীত বিতর্ক রচনা সম্ভব নয়। আমরা জানি যে উনিশ শতকেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, শ্রীরামপুর মিশনের হাত ধরেই হাঁটি হাঁটি পা পা করে বাংলা গদ্যের সূচনা ঘটেছিল। বাংলা বিতর্ক রচনার উপযুক্ত সময়ই ছিল এই উনিশ শতক। রামমোহন, বিদ্যাসাগরের হাত দিয়েই উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বাংলা গদ্যের বিকাশ ঘটেছিল এবং বিতর্ক রচনারও ভাষাপথ সহজ হয়ে উঠেছিল।

বিতর্ক রচনা আবির্ভাবের জন্য শুধুমাত্র সামাজিক ক্ষেত্রই ছিলনা, অন্যান্য ক্ষেত্র ও ছিল ক্ষমতাসীন ব্যক্তিত্ব, দৃঢ়মতবাদ, সমসাময়িক ভাবে নতুনকে গ্রহন এবং পুরাতনকে বর্জন করা সব সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির অভিমুখই সূচিত হয়েছিল এই উনিশ শতকে। সমসাময়িক অবস্থার বিবেচনায় বাধা দেওয়ার জন্য কিছু লোক সে সময় মরিয়া হয়ে উঠেছিল। এর প্রতিক্রিয়ায় সামাজিক ক্ষেত্রে সর্বদিকে বাদী-বিবাদী দুই পক্ষের মধ্যে প্রবল

সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়েছিল। এই বাচিক সংঘর্ষকে বলা যেতে পারে তর্কযুদ্ধ। একদিকে যেমন মুখে মুখে তর্ক চলেছিল তেমনি অন্যদিকে লেখা লেখির মধ্য দিয়েও তর্কযুদ্ধ চলেছিল উনিশ শতকে আর এই তর্ক বা মসীযুদ্ধ থেকেই আজকের বিতর্ক রচনা।

উনিশ শতকীয় সমাজ জীবনে একদিকে প্রগতিশীল ভাবধারা আর তার বিপরীতে অবস্থিত রক্ষনশীল ভাবধারা, আর এই দুই ভাবধারার মধ্যে চলেছিল তীব্র বাদ্‌বিতন্ডা। গোঁড়া রক্ষনশীলদের সাথে উদারপন্থী প্রগতিবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ, প্রবল আত্ম-সচেতনতায় পৌরুষদীপ্ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন সমাজ সংস্কারকদের বিবাদ সে সময় আবশ্যক হয়ে উঠেছিল। দুইপক্ষই একে অপরকে পরাজিত করার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছিল তীব্র যুক্তি। সমাজ যদি একভাবে চলতে থাকে, কোনো মতবিরোধ তৈরি না হয় তবে সেখানে বিতর্ক রচনার কোন প্রশ্নই ওঠেনা। এই যুক্তিবাদের বিকাশ পর্ব উনিশ শতক।

নবচিন্তার আলোকে উদ্বুদ্ধ মানুষেরা সমাজ জীবনে ক্ষতিকারক বিভিন্ন রীতি নীতি দেখে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তারা শুধু ক্রোধের জ্বালা নিয়ে থেমে থাকেন নি কিংবা চিন্তার আকাশে ডুবে না থেকে তারা সমাজের এই কুসংস্কার গুলোকে দূর করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। বিভিন্ন সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরনে প্রগতিবাদীদের এগিয়ে আসার ফলস্বরূপ উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলন এক বিশাল রূপ ধারন করে। রক্ষনশীল প্রবল শক্তি দিয়ে প্রগতিবাদীদের বিরোধীতা করেছিল। এবং প্রগতিবাদী কতিপয় ব্যক্তি যুক্তির তীব্রতায় রক্ষনশীল মনোভাবের অন্তঃসারশূন্যতাকে তুলে ধরেছিলেন। আর এই বাদ প্রতিবাদের ফলশ্রুতিতেই বিতর্ক মূলক রচনার উদ্ভব।

এখন বিতর্ক মূলক পুস্তকের কয়েকটি সাধারণ লক্ষনের কথা আলোচনা করা যেতে পারে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিতর্ক ঝঞ্চার বার্তা প্রদান করাই বিতর্ক রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। আসলে সমসাময়িক অবস্থাই বিতর্ক রচনার উদ্ভব ও বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছিল।

তার্কিকতা বিতর্ক রচনার অন্যতম প্রধান লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য। মতবাদ নিয়ে লড়াই বাঁধে আর লড়াই হয় বলেই তো তর্কের সৃষ্টি হয় এবং তর্ক থেকেই তার্কিকতার সৃষ্টি। বলিষ্ঠ এবং শক্তিশালী যুক্তি স্থান পায় তার্কিকতার মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। ভাষা যত বলিষ্ঠ তীর্যক হবে তর্ক ততই জমে উঠবে। বিরোধী পক্ষকে পর্যুদস্ত

করার জন্য প্রবাদ প্রবচন ছড়ার সংক্ষিপ্ত বাক্যও অনেক সময় ব্যবহার করেন বাদী-বিবাদী দুপক্ষই। বক্তা নিজের বক্তব্যকে রসালো ও সরস করার জন্য ভাষার নব নব আঙ্গিকের আশ্রয় নেন।

বিতর্ক রচনার আরও একটি লক্ষন বা বৈশিষ্ট্য হল ব্যঙ্গবিদ্রুপ নিক্ষেপ করা। তর্ক বিতর্কের সময় ভিন্ন মত বা বিরুদ্ধ মত পোষনকারী ব্যক্তির প্রতি তীব্র আক্রমন চালানো হয়। এক্ষেত্রে অনেক সময় শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে ব্যক্তিগত আক্রমনও করা হয়। আবার মাঝে মাঝে হাস্য রসেরও অবতারণা করা হয়।

বিতর্ক রচনা সমসাময়িকতার দলিল হলেও কিছু কিছু বিতর্ক রচনা সমসাময়িকতার গন্ডি ছাড়িয়ে কালোত্তীর্ণতার মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়। আমরা বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা লক্ষ করে থাকি। বিতর্ক মূলক রচনা সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে–

> "তর্ক একটি মানসিক ক্রিয়া; কাজেই সব যুগেই সমাজ ও মানুষের মধ্যে এই তর্ক বর্তমান-একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। তবে তর্ক থাকলেই যে বিতর্ক রচনা থাকবে, তা কিন্তু আদৌ নয়। সমাজ ও রাষ্ট্র বিষয়ে বিতর্ক বিক্ষুদ্ধ পরিবেশেই বিতর্ক রচনা দেখা দিয়ে থাকে।"[২]

ভারতবর্ষে প্রাচীন কাল পর্বে বিতর্ক রচনা সৃষ্টি হয় নি। বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যে তা লক্ষ করা যায় না। তবে বিতর্ক রচনার সৃষ্টি না হলেও বিতর্কতো নিশ্চয়ই ছিল। মহাভারতের দুর্যোধন ও ধৃতরাষ্ট্রের কথোপকথনের মধ্যেও তা লক্ষ করা যায়।

জড়বাদের উপর প্রতিষ্টিত চার্বাক দর্শনের বিরুদ্ধেও সে কালে ভিন্ন দর্শনপন্থীদের মধ্যেও বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। চার্বাকের প্রত্যক্ষ মতবাদকে জৈন দর্শন কিছুতেই স্বীকার করতে চায় নি। চার্বাক দর্শনের বিরোধীতা করা হয়েছিল জৈন গ্রন্থ 'প্রমেয়-কমলমর্তণ্ড' এ।

পানিনির অষ্টাধ্যায়ী এবং পতঞ্জলির 'কাত্যায়ন' দুটো গ্রন্থেও বিতর্কের অবতারনা লক্ষ করা যায়।

১৮৩২ সালে সমস্ত দেশ জুরে এক আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল সংস্কার বিল নিয়ে, এই সংস্কার বিলকে কেন্দ্র করে ইংলন্ডের পার্লামেন্টে ভীষন বিতর্কের ঝড় উঠে। তখন রামমোহন রায় সেই আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন এবং সাফল্য কামনাও করেছিলেন। রামমোহনের মনে হয়েছিল যে এই আন্দোলন শুধু ইংলন্ডের নয় সারা মানব জাতির ভবিষ্যত এর সঙ্গে যুক্ত। রাজা রামমোহন তাঁর নিজের আবেগ প্রকাশ করে বন্ধু মিসেস উডফোর্ডের কাছে লিখেছিলেন-

> "এই সংগ্রাম কেবলমাত্র সংস্কার পন্থী ও সংস্কার বিরোধীদের মধ্যে নয়, পরন্তু এই সংগ্রামে একদিকে রয়েছে স্বাধীনতা আর অপরদিকে দমন-পীড়ন ও স্বৈরাচার। এই সংগ্রাম ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে।"[৩]

রামমোহন মৃত্যুঞ্জয়াচার্যের 'বজ্রসূচী' নামক সংস্কৃত গ্রন্থটির বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করলে, এই অনুবাদের মধ্য দিয়েই যে উনিশ শতকে বিতর্ক মূলক রচনার সূত্রপাত হয় তা বলা যেতে পারে। নানান ধরনের বিষয় নিয়ে ইংরেজি সাহিত্যেও বিতর্ক রচনা রচিত হয়েছিল। মূলত ধর্মকে কেন্দ্র করেই ইংরেজি সাহিত্যে বিতর্ক রচনার সৃষ্টি হয়েছিল। আমাদের বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাই লক্ষ করা যায়। প্রতিবাদ এবং তার বিপরীতে আত্মরক্ষা বা একটু অন্যভাবে বললে বলতে হয় যে নিজ মতবাদকে রক্ষা করার প্রেরণাই বিতর্ক রচনার প্রধান স্তম্ভ। এই প্রতিবাদ বা আত্মরক্ষা সামাজিক ও হতে পারে, ব্যক্তিগতও হতে পারে, আবার গোষ্টীগতও হতে পারে। আমাদের বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এসকল বিষয়ই প্রধান হয়ে উঠেছিল উনিশ শতকে।

ঊনবিংশ শতকের ছয়ের দশক থেকেই বাংলা সাহিত্যে বিতর্ক মূলক রচনার উদ্ভব ঘটেছিল। অথচ বাংলা সাহিত্যের পথ চলা শুরু হয়েছিল নবম ও দশম শতকে চর্যাচর্যবিনিশ্চয় গ্রন্থের মধ্য দিয়ে। যেহেতু সমাজ ব্যতীত সাহিত্য রচনা হতে পারে না তেমনি বিতর্ক রচনাও সামাজিক ঘাত অভিঘাত ছাড়া রচিত হতে পারে না। আমরা যদি বিতর্ক রচনার কারণ সন্ধান করি তাহলে অবশ্যই আগে আমাদের সমাজ ও সমসময়কে বিশ্লেষন করা আবশ্যক।

কঠোর আত্মপ্রত্যয়, বলিষ্ঠতা, যুক্তি এবং সর্বোপরি মতবাদের ভিন্নতা বিতর্ক রচনার মূলেঅবস্থান করে। তার্কিকদের নিজ নিজ জীবন দর্শনের নিষ্ঠা এবং আত্মপ্রত্যয় ছাড়া উপযুক্ত বিতর্ক রচনা সৃষ্টি হতে পারে না। ব্যক্তির যদি নিজস্ব আত্মসচেতনতাবোধ না থাকে, তাহলে ব্যক্তির মধ্যে বলিষ্ঠ মতবাদ জন্ম নিতে পারে না। আর বলিষ্ঠ মতবাদ ছাড়া ভিন্ন মতের বিরুদ্ধে আপন মতের তর্ক করাও সম্ভব নয়।

চর্যাগানগুলির আবির্ভাব ঘটেছিল মূলত পাল রাজাদের আমলে, তবে এর ধারা প্রবাহিত হয়েছিল সেন আমলেও। রাজতন্ত্রের শক্তপোক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্টিত ছিল পাল রাজবংশ। সে সময়ের সমাজ একজন রাজাকে দেবতার মতো মর্যাদা ও মান্যতা দিত। বৌদ্ধ ধর্মই ছিল পাল আমলে রাজধর্ম। বৌদ্ধধর্ম রাজধর্ম থাকলেও ভিন্ন ধর্মমতকে অপমান করার পক্ষপাতি ছিলেন না পাল রাজারা। প্রজার উপর জোর করে রাজধর্ম চাপিয়ে দেওয়া হত না। আর এজন্যই সে যুগে বাংলার মাটিতে কোনো ধর্ম কলহের সৃষ্টি হয় নি। সে সময় বাংলাদেশে যদিও ধর্ম কলহের সূচনা ঘটতে পারত কিন্তু তা হয় নি কারণ, বৌদ্ধধর্ম শক্তিশালী থাকা সত্ত্বেও সনাতন ধর্মকে কোনো আক্রমন করেনি। তাই স্বাভাবিক ভাবে পাল আমলে ধর্মমতের লড়াই বা কলহ দেখা দেয় নি। আমরা বলতে পারি যে সুষ্ঠ শাসন ব্যবস্থাই তা অনেকটা নিয়ন্ত্রিত রেখেছিল। শেষের দিকে পালরাজত্বের দুর্বলতা দেখা দিলে সেই দুর্বলতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সেন রাজারা বাংলার সিংহাসন দখল করে।

আরেকটি বিষয়ও ভাববার মত। তখনও সে সমাজে সাংস্কৃতিক কলহ বিতর্কের সূত্রপাত ঘটায় নি, এর পেছনে কি শুধু সুষ্টু নিয়ন্ত্রনই অন্যতম কারন ছিল! মনে হয় শুধু তাই নয়। উনিশ শতককে যে মূল কারণটি মধ্যযুগীয় আনুগত্য থেকে স্বাতন্ত্র্য করেছিল, তা হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রাধান্য। একজন ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্টিত হলে তার অনুসঙ্গ হিসেবে যুক্তিসিদ্ধতাও একটা বিশেষ ভূমিকা নেয়, সেই ব্যক্তিত্বের গড়ে উঠার পেছনে। উনিশ শতকের আগে পর্যন্ত যা কিছুই ভেবেছে মানুষ, তা গোষ্টীর হয়ে ভেবেছে, তার নিজস্বতার কোনও পরিচয়কে স্বীকৃতি দেয় নি। আর ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও গোষ্টী পরিচয়ের নিরিখেই তাকে খুঁজতে হয়েছে কিংবা মান্যতাকে গ্রহন করতে হয়েছে। ফলে একটা সময় পর্যন্ত যুক্তিকে দাঁড় করানো গেলেও সংগঠিত ভাবনার স্বীকৃতিকে মানতে হয়েছে। ফলে ব্যক্তিবিশেষের উষ্মা থাকলেও তা সংগঠিত রূপ ধারণ করেনি।

সেন আমলে যদিও পাল রাজাদের শাসন ব্যবস্থার বদল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, তবুও যে যুগে সামাজিক জীবনে নানা বিবাদ দেখা দিয়েছিল। পাল রাজারা যেমন সকল ধর্মকে সমান ভাবে দেখতেন, সেন আমলে কিন্তু তা হয় নি। সেন রাজবংশ পাল রাজবংশের মত উদার ছিলেন না তাই সেন আমলে বৌদ্ধধর্মের বিরোধীতা করতে দেখা গিয়েছিল। কারণ সেন রাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী। কিন্তু সেন আমলের নাগরিক জীবন ছিল বিলাস প্রবন, জীবনবোধের সক্রিয়তা তাদের মধ্যে ছিল না। তাই সে যুগে বিতর্ক রচনার কোন সম্ভাবনা দেখা দেয় নি।

একজন মানুষের মনে কত রকমের প্রশ্ন জেগে ওঠে তা বলা কঠিন। মানুষের মনে জেগে ওঠা নানা প্রশ্নই জন্ম দেয় তর্ক বিতর্কের। আর তর্ক বলতে যে শুধু ব্যঙ্গ বিদ্রুপকে বোঝায় তাও নয়। সৃষ্টিশীল তর্কের গুরুত্ব অপরিসীম।

চর্যার পরবতী কালপর্বে বাংলার রাষ্ট্রীয় জীবনে নেমে আসে এক গভীর অন্ধকার। বিধর্মী তুর্কী আক্রমনের ফলে বাংলার সমাজ জীবনে যে কালো ছায়া নেমে আসে তার স্থায়ীত্ব ছিল প্রায় ১৫০ বছর। এই দেড়শো বছর অন্ধকার কালপর্বে বাংলা সাহিত্যে কিছুই রচিত হয়নি কিন্তু এই আক্রমনের ফলে পলি পড়া বাংলার মাটিতে অনেক ফসলই ফলেছিল বাংলার সাহিত্যে ও সমাজ জীবনে। মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক অবস্থা খুব সুবিধা জনক ছিল না। একদিকে ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় শাষন কর্তা ছিল মোঘলেরা আবার অন্যদিকে বাংলার বিহার উড়িশ্যায় ডিহিদার মামুদ শরীফ এবং বিভিন্ন উজীরদের অত্যাচারের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে তা সত্বেও বাংলা সাহিত্য রচনা স্থিমিত ছিল না। কিন্তু বিতর্ক মূলক রচনা এই সময় পর্বেও রচিত হয়নি।

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলি আলোচনা করলে দেখা যায় যে, সে সময়েও সমাজে নানা ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধিতা ছিল। দেব দেবীদের মধ্যে নানা কারনে একে অপরের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষন করতেন, কলহেও লিপ্ত হতেন। কিন্তু যদিও ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধিতা ছিল, ব্যঙ্গ বিদ্রুপের আভাস যদিও মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে দেখা দিয়েছিল, তবুও সেই নিন্দা বা ব্যঙ্গ বিদ্রুপ নিয়ে বিতর্ক রচনার সুত্রপাত ঘটতে পারেনি মধ্যযুগে।

বাংলা ভাষায় প্রশ্ন উত্তর মূলক পুস্তক রচনা শুরু হয়েছিল ষোড়শ শতক থেকেই। সেই পুস্তক গুলিতে অন্যকে আক্রমন করা হত না, শুধু নিজের বক্তব্য প্রতিষ্টিত করার বাহন হিসেবে প্রশ্ন উত্তর মূলক পুস্তক রচনা করা হত। কিন্তু এই রচনা গুলির মধ্যেও সংগঠিত বিতর্ক রচনার কোনো আভাস ছিল না।

অষ্টাদশ শতকে বাংলাদেশে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। আর বিতর্ক রচনার ক্ষেত্রে সেই শতকের সামাজিক ও সাহিত্যিক অবস্থার গুরুত্ব কিন্তু কম নয়। আর সে সমস্ত ঘটনার মধ্যে দুটি ঘটনার গুরুত্ব খুবই বেশী, সে দুটি ঘটনা হল বর্গী আক্রমন ও ইংরেজ শক্তির ক্ষমতা দখল। এই দুই ঘটনা বাংলার মানুষকে বাস্তব ধর্মী করে তুলেছিল। বর্গীর আক্রমন থেকেই বাংলার সমাজ জীবনে ও শাসন ব্যবস্থায় নানা ব্যতিক্রম দেখা দেয়। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে সমাজে যে ব্যতিক্রম দেখা দিয়েছিল তা কিন্তু সামাজিক বিতর্কের সৃষ্টি করতে পারে নি। বর্গীর আক্রমনের ফলে অসহায় মানুষ দেবতার আশ্রয় নিয়েছিল আত্মরক্ষার জন্য। কিন্তু এতসব ঘটনা ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও কোনো বিতর্কের সৃষ্টি হয় নি। এর কারন যুক্তি সাঁজাতে সক্ষম ভাষার অভাব। কারণ হিসেবে বলতে হয় মধ্যযুগে যে পুস্তক রচিত হয়েছিল, তার সব গুলিই পদ্যের ছন্দে রচিত। আর বিতর্ক রচনার উপযুক্ত ভাষা হল গদ্য। গদ্যের বিচরন ক্ষমতা বহুদূর। বহনক্ষমতাও খুব বেশী। বিতর্ক রচনার ক্ষেত্রে যেমন সামাজিক পটভূমির প্রয়োজন তেমনি উপযুক্ত ভাষারও প্রয়োজন। আর সেই ভাষা হল গদ্য ভাষা। কিন্তু উনিশ শতকের আগে গদ্য ভাষার জন্ম হয়নি। তাই উনিশ শতকের আগে বিতর্ক রচনার বাহন গদ্য ভাষার সূত্রপাত হয়নি। তবে বাংলা মঙ্গলকাব্য গুলির দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে সে যুগে বিভিন্ন ধর্ম মত ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধিতা দেখা দিয়েছিল, এবং বিতর্ক রচনার দানা বাঁধতে শুরু করেছিল মধ্যযুগে। চৈতন্য আবির্ভাবের পর চৈতন্যদেবকে নিয়ে যে সমস্ত জীবনী কাব্য রচিত হয়েছিল তাতে বিভিন্ন শাস্ত্রকারেরা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোন দিয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু কোনো বিতর্কের সৃষ্টি হয়নি। কারন বলিষ্ঠ গদ্য ভাষার তখন সূচনা হয়নি, আর পদ্যের ভাষায় বিতর্ক রচনা অসম্ভব। সবদিক দিয়ে বিচার করে বলতে হয় বিতর্ক রচনার আবির্ভাব হয়েছিল উনিশ শতকেই।

তর্ক যেহেতু মানসিক ক্রিয়া তাই সব যুগের পরিবেশেই বিতর্কের সৃষ্টি হয়। আর এই বিতর্ক দেখা দিয়ে থাকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। ধর্ম বিষয়

সামাজিক চিন্তা রাষ্ট্রনীতির ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা নিয়েই উনিশ শতকের বিদগ্ধ সমাজ বিতর্কমূলক রচনার ক্ষেত্রে কলম ধরেছিলেন। যে যে বিষয় নিয়ে বিতর্কমূলক রচনা লেখা হয় তা হল -

(১) সমাজ সংস্কার বিষয়ক
(২) ধর্মান্দোলন বিষয়ক
(৩) শিক্ষা সংক্রান্ত
(৪) রাজনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত
(৫) সাহিত্যের বিষয় ও রুচি সংক্রান্ত

উনিশ শতকে যে বিষয়গুলি নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল তার মধ্যে প্রধান হল সমাজ সংক্রান্ত বিষয়। আর সামাজিক পটভূমির উপর ভিত্তি করে যে বিতর্কমূলক পুস্তক রচিত হয়েছিল, সেগুলিকে পর্যালোচনা করে দেখাই আমাদের উদ্দেশ্য।

রাষ্ট্র, ধর্ম, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে বিতর্কমূলক রচনার সূত্রপাত হয় নবজাগরনের ফলে। প্রগতিশীল মানুষের উদ্দেশ্য মানুষের মধ্যে ব্যক্তিত্ব জাগিয়ে তোলা আর রক্ষণশীলদের উদ্দেশ্য সেগুলোর অসারতা দেখিয়ে মানুষকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া। সেই অন্ধকারে ঘুমিয়ে থাকা মানুষকে জাগিয়ে তোলার জন্য প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল দুই পক্ষের মধ্যে যে ভাবনা চরিতার্থতার লড়াই সেটাই নবজাগরণের পূর্ণাঙ্গ দিক। আলো আর অন্ধকারের লড়াই দিয়েই বিতর্ক রচনার শুরু। নবজাগরনের সূর্যালোকের মধ্যে রক্ষণশীল সমাজ কীভাবে অন্ধকারের কালিমায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তা আমরা বিতর্ক রচনাগুলির মধ্য দিয়ে জানতে পারি।

বিতর্ক সাধারণত দুই ভাবে হতে পারে, একটি মৌখিক অপরটি লৈখিক। আর এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে মানুষের ভূমিকাটাই বড়। কোনো ব্যক্তি তার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতেন পত্র পত্রিকার মাধ্যমে আবার কোনো কোনো বক্তব্য মুদ্রিত হত পুস্তকের আকারে। তাই আমরা নিঃসন্দেহে এগুলিকে বিতর্ক রচনার মধ্যে আনতে পারি। সমাজ চিন্তার দলিল হিসেবে সেই পত্র এবং পুস্তকগুলির মূল্য অপরিসীম। বিতর্ক রচনার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের এবং সমাজ নেতাদের সমাজ সম্বন্ধে ভাবনা পরিষ্ফুট হয়ে থাকে।

সতীদাহের মত একটি সামাজিক প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। আর সতীদাহের মত একটি ভয়ানক প্রথা প্রচলিত থাকার কারণে সমসাময়িক সামাজিক অবস্থা রাজা রামমোহন রায় কে স্থির থাকতে দেয় নি। তাঁর প্রতিষ্টিত 'আত্মীয়সভা' তে সতীদাহ প্রথা নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়েছিল। সে সময়ের সামাজিক অবস্থা রামমোহনকে ঐ বিষয়ে ভাববার জন্য বাধ্য করেছিল। সে সময়ে সমাজে অনেক নারীই স্বামীর সঙ্গে সহমরনে গিয়ে সতী হয়েছেন, কিন্তু তাদের মধ্যে হয়তো বা অনেকে ইচ্ছায়, আবার অনেকে অনিচ্ছায় সমাজের তাগিদে। আর এই ভাবে যখন সতীদাহের প্রথা সমাজে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তখন মানবতাবাদী রামমোহন ওই প্রথা বিলোপে এগিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন।

শুধু মাত্র শাস্ত্র নির্দেশ মান্য করার কারনেই যে সতী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল তা কিন্তু নয়, সে সময়ের আর্থিক সংকট, আর্থিক টানাপোড়েন ও তার জন্য দায়ী ছিল। বিনয় ঘোষ তাঁর বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত গ্রন্থে বলেছেন-

> "বহু বিবাহের বিস্তারের corollary বা প্রতিফলন হল বাল বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি। কুলীনের স্ত্রী পিতৃগৃহবাসী, এমনিতেই সে অর্থনৈতিক বোঝা। তার উপর বৈধব্যের যন্ত্রনা তার জীবন কে আরও দুর্বিষহ করে তুলল। তখন সহমরনের শৌর্যবীর্যের আদর্শও বিকৃত হয়ে দায় মুক্তির অপকৌশলে পরিনত হল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের মধ্যে সহমরনের সংখ্যা বাংলাদেশে সবচেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল, কোন শাস্ত্রীয় বা আদর্শগত যুক্তি দিয়ে যার ব্যাখ্যা করা যায় না।"[৪]

উপরেউল্লেখিত মন্তব্য থেকে সহজে অনুমান করা যায় যে উনিশ শতকের দুয়ের দশক থেকে সহমরন প্রথা প্রবল ভাবে মাথা চড়া দিয়েছিল সমাজ জীবনে। সতীদাহ প্রথা আইনত নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে প্রগতিশীলরা যেমন আনন্দিত হয়েছিলেন, তেমনি সংস্কার বিরোধীরা বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন এবং এ বিষয়ে বিতর্কও কম হয় নি। সতীদাহের স্বপক্ষে যারা সবচেয়ে বেশী মত প্রকাশ করতেন এবং রামমোহনের বিরোধিতা করতেন তাদের মধ্যে রাধাকান্ত দেব অন্যতম ব্যক্তিত্ব। এই আইনের পুনর্বিবেচনা করার জন্য রক্ষনশীল

হিন্দু সমাজ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে আবেদন করেছিলেন। যারা আবেদন করেছিলেন তাঁরা হলেন নিমাইচাঁদ শিরমনি, রাধাকান্ত দেব, জয়গোপাল তর্কালংকার। কালাকান্ত বিদ্যাবাগীশ, রামজয় তর্কালংকার, মহারাজ গিরীশচাঁদ এবং আরও অনেক ব্যক্তি বর্গরা।

রামমোহনের সহযোগিতায় ও নেতৃত্বে সতীদাহ প্রথা নিবারন আন্দোলন অনেক তীব্র হয়ে উঠেছিল। তখন সমাজের অনেক চিন্তাশীল মানুষও আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন এবং তাদের মত পোষন করেছিলেন। সেই সময়কার 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা সে যুগের সতীদাহ প্রথার পক্ষে ও বিপক্ষে অনেকের মতামত প্রকাশ করত। ১৮২৭ সালের ৫ মে, এক ব্যক্তি 'সমাচার দর্পন' এর মাধ্যমে সতীপ্রথার বিরোধিতা করে বলেছিলেন-

> "শাস্ত্রের ভালমন্দ পরমেশ্বর জানেন, আপাতত শাস্ত্র দেখাইয়া এমত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওন কিম্বা করান, বিশিষ্ট লোকের অনুচিত।"[৫]

রামমোহন সতী বিষয়ে যে পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন তাতে সতীপ্রথা বিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছিল, কিন্তু তা আবার কিছুদিন পরে ঝিমিয়ে পড়েছিল। রামমোহনই ছিলেন সতীপ্রথা বিরোধী আন্দোলনের অগ্রণী পুরুষ। রামমোহন ধর্ম ও সমাজ দুইয়েরই সংস্কার করতে চেয়েছিলেন। তাঁর ধর্মবোধ ও সেই ধর্মের সংস্কারই ছিল সমাজ সংস্কারের একমাত্র প্রেরণা। ধর্ম বিশ্বাসের মূল সত্যের ওপর যে বিধি নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয় তাতে সে সমাজের যে কত অঘটন ঘটে এবং সে ধর্মবোধকে বিশ্বাস করে সমাজে যে কত কুসংস্কার দেখা দেয় তা রামমোহন মনে প্রানে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু সতীপ্রথার বিরোধিতা যে রামমোহনের ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে উদ্বুদ্ধ তা কিন্তু নয়, তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত বেদনাবোধ থেকে সতীদাহপ্রথার বিরোধিতা করেছিলেন। কোনটি ধর্ম আর কোনটি অধর্ম তা বিচার করবে শাস্ত্র। তাই তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রীয় যুক্তি দিয়ে দেখিয়ে দিলেন সতীপ্রথা অশাস্ত্রীয়। সতীপ্রথাকে যারা সমর্থন করেছিলেন তাদের মধ্যে রক্ষনশীল সমাজের মানসিকতা স্পষ্ট।

রামমোহনের অনেক পরেও সতীদাহপ্রথা নিয়ে নানা বিতর্ক হয়েছিল। বঙ্গদর্শনে চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সতী' এবং নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবাদ প্রবন্ধ বিতর্কের উদাহরণ। চন্দ্রশেখর ছিলেন রক্ষনশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং নগেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রগতিশীল সমাজের প্রতিনিধি। চন্দ্রশেখর সতী প্রথা পক্ষে বক্তব্য পেশ করলে

নগেন্দ্রনাথ তার বিরোধীতা করেন। এই সংস্কারমুক্ত মানুষটি তাঁর সংস্কারমুক্ত মন নিয়েই সমাজের কল্যাণ অকল্যাণের বিচার করতেন। চন্দ্রশেখর সতীদাহপ্রথার পক্ষে বলেছিলেন-

> "সহমরন উঠাইয়া দেওয়ায় হিন্দুর বিধবার কি লাভ হইয়াছে? এইমাত্র যে তখন একদিন পুড়িত, এখনও পুড়িতে পায়, কেবল মরিতে পায় না।"[৬]

এই মন্তব্যের বিরোধিতা করে নগেন্দ্রনাথ বলেছিলেন –

> "শোকাবেগ সম্বরনে অক্ষম হইয়া মুহুর্ত মধ্যে শরীর ভস্মসাৎ করা অপেক্ষা, কি দীর্ঘ জীবনের পরোপকার, ইন্দ্রিয়দমন, সহিষ্ণুতা ও পবিত্রতার দৃষ্টা(!), শ্রেষ্টতর নহে?"[৭]

সতীদাহের পক্ষে এবং রামমোহনের বিরোধিতা করে 'বিপ্র' নামে এক ব্যক্তি বলেছিলেন, সমাজে সকাম লোকের সংখ্যা বেশি, তাই সকামকর্ম সতী হওয়া নিন্দার ব্যাপার নয়। জবাবে রামমোহন যা বলেছিলেন তাতে বলিষ্ঠ প্রগতিশীল মনোভাব ও সমাজ চিন্তার স্পষ্ট রূপ ফুঁটে উঠে। তাঁর মতে অধিক সংখ্যক মানুষ যা করবে তাই যে ভাল তা কিন্তু নয়।

বিতর্ক পুস্তক সব চাইতে বেশী রচিত হয়েছিল বিধবাবিবাহ নিয়ে। সে যুগের শিক্ষিত সমাজ ও সমাজ নেতাদের সামাজিক মননের পরিচয় পওয়া যায় বিতর্ক রচনা গুলির মাধ্যমে। ১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধকে বিদ্যাসাগরীয় যুগ বলা হয়, কারন ১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারের সুচনা। তাঁর সমাজ সংস্কারমুলক প্রথম পুস্তক 'বাল্যবিবাহেদোষ'। এই প্রবন্ধটিতে বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহের দোষ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নারীর স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিধবার দুঃখজনক অবস্থা, সমাজের দুর্নীতি সব কিছুরই কম বেশী উল্লেখ করেছেন।

রামমোহন যখন সতীপ্রথা নিবারণ আন্দোলনে সরব ছিলেন তখন উনিশ শতকের প্রথমার্ধ। তখন বিদ্যাসাগরের কৈশোরসময়। সমাজের অবস্থা কিছুটা তখন তাঁর চোখে পড়েছিল। সেই যুগের সামাজিক অবস্থা বুঝার মত স্বক্ষমতা তাঁর ছিল, তাই রামমোহন

যে সমাজ সংস্কার আন্দোলন শুরু করেছিলেন বিদ্যাসাগর তার থেকে দূরে থাকতে পারেন নি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্থে শুরু হয় বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার আন্দোলন।

নারীজাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। বাল্যকালে বিবাহ হলে নারীকে যে কতটুকু দঃখজনক জীবন যাপন করতে হয় এবং অল্প বয়সে বৈধব্য ধারণ করে তার যে কি পরিণতি হয় তা তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন। নারীর প্রতি তাঁর হৃদয় ছিল করুণ, তিনি নারীর দু:খ সহ্য করতে পারতেন না, তাই তিনি নারীর দঃখ মোচনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। বহু বিবাহ বিষয়েও বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব ও করুনার প্রকাশ পায়। তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও বেদনাবোধ তাঁকে বহুবিবাহ বিরোধ আন্দোলনের দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

বিধবাবিবাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের সামাজিক অবস্থা যে কি ছিল তা আমরা তাঁর বিধবাবিবাহ বিষয়ক পুস্তকে প্রমান পাই। এই পুস্তকের শুরুতেই তিনি বলেছেন-

> "বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত না থাকাতে যে নানা অনিষ্ট ঘটিতেছে, ইহা এক্ষনে অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। অনেকেই স্ব স্ব বিধবা কন্যা, ভগিনী প্রভৃতির পুনর্বার বিবাহ দিতে উদ্ধত আছেন। অনেকে ততদূর পর্যন্ত যাইতে সাহস করিতে পারেন না; কিন্তু এই ব্যবহার প্রচলিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন।"[৮]

বিদ্যাসাগরের এই উক্তি থেকে আমরা বুঝতে পারি সমাজ ও যুগ ভিতরে ভিতরে বিধবাবিবাহকে সমর্থন করছিল, আর সেই সমাজকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। বিধবা বিবাহ মূলক দুটি পুস্তকেই তাঁর যুগচেতনা ও হৃদয়াবেগের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর সমাজ গঠনে ধর্মের কোনো ভূমিকাই ছিল না।

বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহকে সমর্থন করে যারা তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান তাঁদের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত অন্যতম। বিধবাবিবাহ প্রচলিত না থাকার কারণে সমাজের যে বাস্তব রূপ ছিল তা তিনি অনুধাবন করেছিলেন বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের প্রভাবে।

বিধবাবিবাহ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা' গ্রন্থে তাঁর প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি শাস্ত্র থেকে

যুক্তিকেই বেশী প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাঁর মতে যাহা যুক্তিসঙ্গত তাই শাস্ত্র, আর অযৌক্তিক সব অশাস্ত্রীয়। তিনি বলেন বিধবাবিবাহ শাস্ত্রে না থাকলেও হওয়া উচিত কারণ তা যুক্তিসঙ্গত। বিরোধীপক্ষের মন্তব্য ছিল বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকলে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। উত্তরে দেবেন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে যদি এত ভয় থাকে তাহলে আইন পাশ করা হোক যে প্রত্যেক ব্যক্তির একটি সন্তানের বেশী হলে তাকে শাস্তি পেতে হবে। বিধবাবিবাহের পক্ষে দেবেন্দ্রনাথের দেওয়া যুক্তির মধ্যে তাঁর অভিজ্ঞতাপূর্ণ সমাজ চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

পীতাম্বর সেন ছিলেন রক্ষনশীল মনোভাবাপন্ন, তাই বিধবার যে সমস্যা তা তার কাছে কোনো সমস্যাই নয়। রক্ষনশীল মনোভাবের মধ্যে মানবতার কোনো জায়গা নেই। বিদ্যাসাগর তাঁর বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তকে জানিয়েছেন, সমাজের এক অংশ ভেতরে ভেতরে বিধবাবিবাহ চাইতেন কিন্তু সংস্কারের ভয়ে তারা এগিয়ে আসতেন না।

সমাজে প্রচলিত প্রথা ও সংস্কার মেনে চলার আকুলতা নন্দকুমার কবিরত্ন ও অন্যান্যদের মধ্যে এত বেশী ছিল যে নিজের রক্ষনশীল মনোভাবকে প্রতিষ্টা করার তাগিদে তারা শাস্ত্রের পর্যন্ত অপব্যাখ্যা করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। রক্ষনশীল সমাজে কোনো যুগচেতনাই ছিল না। বিধবাবিবাহ প্রচলিত না থাকাতে সমাজে ভ্রুণহত্যা, অধঃপতন হচ্ছে তা নন্দকুমার স্বীকার করলেও বিধবাবিবাহকে তিনি সমর্থন করতে পারেন নি।

প্রসন্ন কুমার শর্মার সমাজ চিন্তার পরিচয় আমরা পাই তাঁর ‘বিধবাবিবাহ শাস্ত্র বিরুদ্ধ’ গ্রন্থে। সমাজ সংস্কারক বা সমাজ রক্ষার জন্য কি করা উচিত ও কি করা অনুচিত একথা তিনি তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি আবার একথাও বলেছেন যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হলে সমাজ অধঃপাতে যাবে। তখন তাকে আমরা আর সমাজের উন্নতির সাধকও বলতে পারি না। তিনি বিধবা নারীর যে কর্তব্য নির্ধারণ করেছেন তাতে বিধবা নারীর আর নিজস্ব সত্তা টিকে থাকে না। তাঁর মতে বিধবা নারীর কাজ হচ্ছে পূজার্চ্চনা করা আচার বিচার মেনে চলা। ঘরের কাজে আটকে থাকলে তার কর্তব্যে ব্যাঘাত ঘটবে, আর এই মনোভাবই বিধবা নারীকে সমাজ থেকে দূরে রাখে।

বিগত শতকে অনেক মানুষই বিধবাবিবাহকে সমর্থন করতেন না, আবার বিধবাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন ও করতেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করতেন একজন নারী যাতে বিধবা না হয় সে দিকে নজর দিতে হবে। পুরুষ যাতে অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে না পড়ে তার স্বাস্থেরও যত্ন নেওয়া আবশ্যক। কিন্তু এভাবে তো আর বৈধব্য আটকানো যাবে না। আসলে এটা ছিল রক্ষনশীল মনোভাবাপন্ন মানুষের ধারণা। নারীর প্রতি সহানুভুতি থাকা সত্ত্বেও রক্ষনশীল মনের মানুষেরা বিধবাবিবাহকে সমর্থন করতে পারতেন না।

বিদ্যাসাগরের মতে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষ নারীর উপর নানা ধরনের বিধি নিষেধ চাপিয়ে দিত। যার ফলে নারী অনেক দুর্ভোগের স্বীকার হত। বিদ্যাসাগর পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অবস্থান চিন্তা করে নারীর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর মনের এই সহানুভূতি তাঁর সমাজ চিন্তার একটি বড় দিক।

বিধবাবিবাহ নিয়ে তর্ক যুদ্ধ শুরু হয় বিদ্যাসাগরের 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' পুস্তকটি প্রকাশিত হওয়ার পরে। এই পুস্তকে তিনি বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা বিচারে মনোযোগী হয়েছিলেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন মানুষ যুক্তি বোঝে না শাস্ত্রই বোঝে। এই পুস্তকে তিনি শাস্ত্রীয় যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে যা সম্ভব ছিল কলি যুগের মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। মনু বলেছিলেন নানা যুগে নানা ধর্ম, কিন্তু কোন যুগে কোন ধর্ম তা তো মনু বলেননি। বিদ্যাসাগর যুক্তি ও তথ্য দ্বারা সে সমস্যার সমাধান করেছেন এবং বলেছেন কলিযুগে পরাশর সংহিতার বচনই পালনীয় তাই তিনি পরাশর সংহিতা থেকে বচন উদ্ধার করে তাঁর বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমানের চেষ্টা করেছেন, এবং সফলও হয়েছেন।

বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তকের প্রতিবাদ পীতাম্বর সেন ও অন্যান্যরা করেছিলেন। কোড়কদি নিবাসী রামধন দেবশর্মা তাঁর 'বিধবাবিবাহ নিষেধক' পুস্তকটি বিদ্যাসাগরের প্রথম পুস্তকের প্রতিবাদে রচনা করেন। বিদ্যাসাগর তাঁর প্রথম পুস্তকে কলিযুগে বিবাহিত বিধবার সন্তানের স্থান নির্ণয়ের ব্যাপারে যা বলেছিলেন তা রামধন মেনে নিতে পারেন নি। তিনি বলেন বিবাহিতা বিধবার পুত্র যে ঔরসপুত্র তা কীভাবে মেনে নেওয়া যাবে। বিদ্যাসাগর মহাভারত থেকে দৃষ্টান্ত নিয়ে বলেছিলেন বিবাহিতা বিধবা উলুপীর গর্ভের সন্তান অর্জুনের ঔরসপুত্র হিসেবেই পরিচিত লাভ

করেছিল। রামধন সেই পুত্রকে 'আত্মজ' পুত্র বলে অভিহিত করেন। বিদ্যাসাগরের মতে কলিযুগে পরাশর শাস্ত্রকেই মান্যতা দেওয়া উচিত, কিন্তু রামধনের মতে-

> "পরাশর শাস্ত্রে বিহিত কর্ম্ম বা ধর্ম্ম যদি মন্বাদি শাস্ত্রাভিপ্রায়ের বিপরীত হয় তা হলে কলিযুগে তা আচরণীয় হবে না।"[৯]

বিধবাবিবাহ প্রচলিত না থাকার কারণে সমাজে যে অনর্থ ঘটতে চলেছিল, বিদ্যাসাগরের এই কথাটি রামধন মেনে নিতে পারেন নি। রামধনের মতে অনাচার সধবারাও করতে পারে। যদিও তিনি একথার যুক্তি দিতে পারেন নি। কারণ একজন বিধবা রমনী যেভাবে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারেন, একজন সধবার পক্ষে তা সম্ভব নয়। বিদ্যাসাগরের মতে বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকলে ঈশ্বরের অভিপ্রেত প্রজাবৃদ্ধি আটুট থাকবে। রামধন একথার বিরোধিতা করে বলেন প্রজাবৃদ্ধি যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত তাহলে বন্ধ্যা নারীর জন্ম হয় কেন।

সে যুগের বহু বিরোধী পক্ষের জবাব দিতে গিয়ে বিদ্যাসাগর 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' নামক দ্বিতীয় পুস্তক রচনা করেন।

বিদ্যাসাগরে সমালোচকেরা সকলেই গোড়া রক্ষনশীল ব্যক্তি। যার জন্য যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাতে যে স্থৈর্য ও পূর্বধারনা মুক্ত বৈজ্ঞানিক বিচার বুদ্ধি থাকা প্রয়োজন তা তাদের ছিল না। বিদ্যাসাগর বলেন অনেক প্রতিবাদী পুস্তকে কতগুলি অলীক অমূলক আপত্তি উত্থাপন করা ছাড়া আর কিছু নেই।

বিদ্যাসাগরের বিরোধীরা সকলেই মানতেন যে 'নষ্টেমৃতে' বচন নামে বাগদত্তা নারীর যদি হবুবর মারা যায় তবেই তার পুনর্বিবাহ হতে পারে। বিধবা নারীর বিবাহের কথা নয়। তার জবাবে বিদ্যাসাগর বলেন-

> "স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে ক্লীব স্থির হইলে, সংসার ধর্ম পরিত্যাগ করিলে অথবা পতিত হইলে স্ত্রীদিগের পুনর্বার বিবাহ করা শাস্ত্র বিহিত।"[১০]

বিদ্যাসাগর নিজের মতামত আরও যুক্তি প্রমান দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর মতে নষ্টেমৃতে যে পাঁচটি বচনের কথা বলা হয়েছে সেগুলি বিবাহিতা নারীর পুনর্বিবাহের

ব্যাপারে প্রয়োগ করা যায়। বিদ্যাসাগর নিজ বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করতে 'নারদসংহিতা'রও সাহায্য নিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন 'নারদসংহিতা'র বক্তব্য অনুযায়ী পরাশর বচন বাগদত্তা নারীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ হতে পারে না। কারন বাগদত্তা নারীর সন্তান থাকে না।

বিদ্যাসাগর নানা যুক্তি দিয়ে বিরোধীদের বক্তব্যকে যুক্তিহীন করেছিলেন এবং বলেছিলেন মাধবাচার্য পরাশর সংহিতাকে কলিযুগের শাস্ত্র বলে মেনে নিয়েছিলেন তাই পরাশর সংহিতার 'নষ্টেমৃতে' বচনটি সে যুগের ব্যাপারেই প্রয়োগ হবে।

বিদ্যাসাগরের বিতর্কমূলক রচনা সকল দিক থেকে ত্রুটি মুক্ত। শাস্ত্রীয় আলোচনায় তিনি যুক্তি এবং তর্কের গাম্ভীর্য বজায় রেখেছিলেন। তাই এই ধরনের আলোচনায় সামান্য ব্যক্তির আক্রমন ও ব্যঙ্গ বিদ্রুপাত্মক কথা তিনি সহ্য করতে পারেন নি।

বিধবাবিবাহকে নিয়ে যেমন বিতর্ক হয়েছিল, অনুরূপ ভাবে বাল্যবিবাহকে কেন্দ্র করে 'বাল্যবিবাহ' বিষয়ক বিতর্ক রচনা রচিত হয়েছে। বিদ্যাসাগর 'বাল্যবিবাহে দোষ' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এই প্রবন্ধেও আমরা প্রগতিশীল কু-সংস্কার বিরোধী বিদ্যাসাগরকে পাই। এখানেও আমরা বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার মূলক মানস চেতনার পরিচয় পাই।

বিদ্যাসাগর ছাড়াও বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে বাল্য বিবাহের কু-ফল নিয়ে লেখালেখি শুরু হয়েছিল। ১২৬২, কার্তিক মাসে 'বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা' পত্রিকায় বাল্যবিবাহ নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটিকে বাল্যবিবাহের ফলে সমাজে যে কত বড় ক্ষতি ঘটে যাচ্ছিল তারই একটি চিত্র আমরা পাই। বেশীর ভাগ প্রগতিশীল প্রবন্ধকারের মতে 'বাল্যবিবাহ সামাজিক অধঃপতনের কারন', কেউ বলেছেন অসভ্যদেশের রীতি, দারিদ্র বৃদ্ধির কারন, আবার কেউ কেউ বাল্যবিবাহকে ব্যাভিচারও বলেছেন। রামচন্দ্র দত্ত তার বাল্যবিবাহ প্রবন্ধে এর কুফল নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। অপরদিকে বাল্যবিবাহের সমর্থনের অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'হিন্দুবিবাহ' নামে যে প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন তাতে সমাজে সুখ শান্তি বজায় থাকার জন্য বাল্যবিবাহকে প্রয়োজনীয় বলে উল্লেখ করেছেন। শুধু মাত্র বাল্যবিবাহই নয় 'সমাজ দীপিকা' পত্রিকাতে পন প্রথার মত সমাজের কু-সংস্কারের

বিরুদ্ধেও আলোচনা করা হয়েছে। সমাজের আরও একটি কুপ্রথা সুরাপান প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বহু বিতর্ক মূলক রচনা রচিত হয়েছিল।

মূলত গৌরীদানের পুন্যলাভের আশায় যে ব্রাহ্মণ্য সমাজ বাল্যবিবাহের মত কু-প্রথার সৃষ্টি করেছিল তা বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন। শাস্ত্র নির্দেশকদের মতে কন্যার ঋতুশলা হওয়ার পূর্বেই তাকে পাত্রস্থ করা উচিত। কিন্তু এগুলি বিদ্যাসাগর কোনো মতেই মেনে নিতে পারেন নি। তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে বাল্যবিবাহের ফলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে মধুর প্রেম ও ভালবাসা থাকে তাও দেখা দেয় না। বাল্যবিবাহ বালক বালিকার বিদ্যাচর্চাতেও বিঘ্ন ঘটায়। পরিণত বয়সের পূর্বে ছেলের বিবাহ হলে সে আর্থিক ভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার পূর্বেই সে সন্তানের পিতা হয়ে যায়। অনেক মেয়েরা আবার সংসার পালনের দায়িত্ব বোঝার আগেই হয়তো বিধবাও হয়ে যায়।

রক্ষনশীল সমাজ বাল্যবিবাহকে সমর্থন করত। প্রগতিশীল মানসিকতার মতে বাল্যকালে বিবাহ হওয়ার ফলে অল্প বয়সে সংসারের দায়িত্ব এসে পরার কারণে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে ছেলেদের রোজগারের চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়। কিন্তু রক্ষনশীলদের মতে কন্যার বাবা যদি বিষয় সম্পন্ন হন তাহলে নিজের জামাতাকে লেখাপড়া শেখাতে পারেন। রক্ষনশীলদের মতে বালক বালিকার অল্প বয়সে বিবাহ হলে ব্যভিচারগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। প্রগতিশীলদের মতে পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকলে তাদের ব্যভিচারগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে যুক্তি দিতে গিয়ে বিদ্যাসাগর শাস্ত্রগত, মনস্তাত্বিক ও শারীরিক জ্ঞানের কথা যেমন বলেছেন তেমনি সামাজিক অভিজ্ঞতার পরিচয়ও প্রদান করেছেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ বিদ্যাসাগরের মতের সমর্থক ছিলেন। ১৭৭৬ সালে ‘বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা’য় প্রকাশিত তাঁর ‘বাল্যবিবাহ’ প্রবন্ধে বাল্যবিবাহের দোষ ব্যক্ত করে বলেছিলেন–

> “অল্প বয়সে বিবাহের জন্যে সন্তান ধারনে নারীর ক্লেশ ঘটে, গর্ভবতীর নারীর মৃত্যুও ঘটে সময় সময়। শিশু মৃত্যুও ঘটে থাকে। সুস্থ শিশু ভূমিষ্ট হয় না;- ভূমিষ্ট হলেও তার আয়ু কম হয়। প্রসুতির দুর্ভোগের শেষ থাকে না। বাল্যবিবাহের ফলে অনভিজ্ঞ বালিকা অক্ষম হলেও

সাংসারিক দায় দায়িত্বের বোঝা বহন করতে বাধ্য হয়। তার ফল ভাল হয় না।”[১১]

ধর্মশাস্ত্রকার মনুর মতে একজন কুমারী যৌবন প্রাপ্ত হওয়ার তিন বৎসর পর বিবাহ করার নির্দেশ দেন। রামচন্দ্র গুপ্ত পুরুষের ২৭ বৎসর বিয়ে করার উপযুক্ত সময় বলে মনে করেন।

বাল্যবিবাহের পক্ষে যে সমস্ত পত্রিকা মত প্রকাশ করত ‘নবজীবন’ তার মধ্যে অন্যতম। বাল্যবিবাহের পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে অক্ষয়চন্দ্র সরকার কম বাদ্‌বিতন্ডা করেন নি প্রগতিশীলদের সাথে।

বাল্যবিবাহের বিরোধিতার ক্ষেত্রে রামমোহন রায় ছিলেন সর্বাগ্র ব্যক্তিত্ব। তাঁর প্রতিষ্টিত আত্মীয়সভাতে যদিও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আলোচনা করা হত কিন্তু তিনি নিজে বাল্যবিবাহের বিষয়ে কোনো প্রবন্ধ লেখেন নি। ঈশ্বরগুপ্তের ‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রিকাতেও বাল্যবিবাহের বিষয়ে বেশ কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। তবে বিদ্যাসাগরের সময়েই বাল্যবিবাহ বিষয় নিয়ে মতামত প্রকাশ প্রবল হয়ে উঠেছিল দেশের বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে।

বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় যদিও বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করা হত কিন্তু ঐ আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য খুব কম সংখ্যক প্রভাবশালী হিন্দু কার্যকারী ভূমিকা নিয়েছিলেন। তবে ব্রাহ্ম সমাজের নেতারা প্রবল ভাবে এগিয়ে এসেছিলেন। ভারত সংস্কার পত্রিকা সে সময়ে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠনে এগিয়ে আসে। বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করে এই পত্রিকায় বলা হয়েছিল–

“হিন্দু সমাজে যত প্রকার পাপ প্রথা আছে বাল্যবিবাহ তন্মধ্যে প্রধান। কি শরীর কি মন সমদয়ের দুরবস্থার প্রবল কারন এক বাল্যবিবাহ।”[১২]

ঢাকা শহরে কিছু যুবক মিলে ‘বাল্যবিবাহ নিবারণী’ নামে একটি সভা প্রতিষ্টিত করেছিল, সেই সভায় নির্দেশ জারি করা হয়েছিল পুরুষের ২১ বৎসর, এবং মেয়েদের ১৪ বৎসর বয়সের পূর্বে বিবাহ করা যাবে না। এই সভাটি একটি পত্রও প্রকাশ করেছিল

'মহাপাপ বাল্যবিবাহ' নামে। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকাও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিল। আবার 'সমাজ দীপিকা' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে তাতে বলা হয়েছে–

> "আমরা না বালিকার, না পূর্ণ যুবতীর বিবাহে পক্ষপাতী। আমাদের মত, দশ বৎসর হইতে দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বর্ষ পর্যন্ত বিবাহের মূখ্যকাল। ----- স্ত্রীগনের দশ ও পুরুষের ষোড়শ বর্ষাবধি বিবাহই যুক্তিযুক্ত।"[১৩]

শ্যামসুন্দরী দেবী 'বাল্যবিবাহ ও অবরোধ প্রথা' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। তিনি বাল্যবিবাহকে নিতান্ত অসভ্যদেশের কাজ বলে মনে করতেন। তিনি জানান যে বাল্যবিবাহ কোনো বিবেকধারী লোকের কাজ নয়, এবং প্রাচীন ভারতে এ প্রথা প্রচলিত ছিল না। তাঁর মতে বালক বালিকার এমন বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত যে, স্বামী বা স্ত্রী প্রয়োজন হলে একে অপরকে সামাজিক অসৎ আচরণ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে। আর বাল্য কালে যদি বিবাহ হয় তাহলে তা সম্ভব হয়না। কারো কারো মতে বাল্যবিবাহের ফলে বালক বালিকার মনে কোনো কলঙ্ক থাকেনা। এই মন্তব্যের জবাবে শ্যামসুন্দরী দেবী বলেছেন যে শিক্ষা দীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত থাকলে অল্প বয়সে চরিত্র খারাপ হতে পারেনা। বালিকাও যদি একটু বেশী বয়স পর্যন্ত পিতার ঘরে থেকে ভাল শিক্ষা লাভ করে তবে বিবাহের পরও তার চরিত্র কখনো খারাপ হয়না।

একদল ছিলেন যারা মধ্যমপন্থী। তারা বাল্যাবিবাহকে সমর্থনও করতেন না আবার আইনের দ্বারা তা বন্ধ হোক তাও চাইতেন না। তাদের মতে বাল্যবিবাহ সামাজিক দোষ, সুতরাং সমাজেই তা নিয়ে আলোচনা করা হোক, তার জন্য আইনের সাহায্য নিতে তাদের মত ছিল না।

শেষে আমার বলতে পারি বস্তুত বাল্যবিবাহ নিয়ে নানা ধরনের মতের বিনিময় হয়েছিল মৌখিক ও লৈখিক ভাবে। কিন্তু বাল্যবিবাহ নিয়ে যতই মত বিনিময় ঘটে থাকুক না কেন বাল্যবিবাহ আন্দোলনের অগ্রনী পুরুষ ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। যে সকল ব্যাপার নিয়ে কারো কারো চোখ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠত, যাদের ভ্রু কুঞ্চিত হত, বিদ্যাসাগর সমাজের কু-সংস্কার দূর করার জন্য তাকেই বরমালা পরিয়েছেন। কিছু কিছু উন্নত ব্রাহ্ম ও শিক্ষিত হিন্দু বাল্যবিবাহকে তাদের তালিকা থেকে বাদ দিলেও, সমাজের একটি বড় অংশে বাল্যবিবাহ এখনও যেমন তেমনই রয়ে গেছে।

আর একটি সামাজিক রোগ যা উনিশ শতকে প্রচলিত ছিল তা হল কৌলিন্য প্রথা ও বহুবিবাহ। এই সামাজিক কুপ্রথা নিয়ে উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই ক্রমে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। খ্রিষ্টান মিশনারীরাই এদেশে প্রথম কৌলিন্য ও বহুবিবাহের বিরধিতা করেছিল। তারা এবিষয় নিয়ে প্রচার ও চালিয়েছিল। খ্রিষ্টান মিশনারীরা যে উদেশ্য নিয়েই এর বিরোধিতা করে থাকুক না কেন তাতে উপকার হয়েছে এদেশেরই। আত্মীয় সভার মাধ্যমেই বাঙালি প্রথমে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে এ প্রথার বিরোধিতা করেছিল। তাছাড়াও রামমোহনের বিভিন্ন বক্তব্যের মাধ্যমেও অনেকে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে মতবাদ জানিয়েছিলেন।

রামমোহন সমসাময়িক কালপর্বে বাংলাদেশে ডিরোজিওর নেতৃত্বে বিভিন্ন সামাজিক কু-প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন সংঘঠিত হয়েছিল। কৌলিন্যপ্রথা সমাজে সামাজিক শিথিলতা নিয়ে এসেছিল। সমাজে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল যে কুলীন ব্রাহ্মন ভিন্ন অন্য ব্যক্তির পক্ষে বিবাহ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। এই বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য ধীরে ধীরে এর বিরুদ্ধে আন্দোলনও শুরু হয়েছিল।

গর্ভনমেন্টের কাছে সমাজের উচ্চ শিক্ষিত সমাজ সচেতন ব্যক্তিরা বহুবিবাহের বিরুদ্ধে ১৮৫৪ সালে একটি আবেদন পত্র প্রেরণ করেছিলেন। ক্রমে সমগ্র দেশে এই প্রথার বিরুদ্ধে মতবাদ প্রবল আকার ধারণ করেছিল।

বহুবিবাহের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশী সোচ্চার হয়েছিলেন কিশোরীচাঁদ মিত্র। তাঁরই উৎসাহ এবং উদ্যোগে ১৮৫৪ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে 'সমাজোন্নতি বিধায়িনি সুহৃদ সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বহুবিবাহের বিরুদ্ধে প্রথম আবেদন পত্র এই সমিতিই পাঠিয়েছিল। বহুবিবাহের পক্ষেও কম আবেদন পত্র পড়েনি সে সময়ে। ১৮৫৫-১৮৫৭ পর্যন্ত বহুবিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে বহু আবেদন পত্র জমা পড়েছিল। বর্ধমান রাজা সহ বিদ্যাসাগর স্বাক্ষরিত আবেদন পত্রও জমা পড়েছিল। বহুবিবাহ রদ করার ব্যাপারে রমাপ্রসাদ রাও এরও গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা ছিল। ১৮৬৬ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে বহুবিবাহ রদ করার জন্য একটি পত্র প্রেরন করা হয়। সতীশচন্দ্র ও ব্যক্তিবর্গের স্বাক্ষর করা একটি উল্লেখযোগ্য পত্র লেফটেনেন্ট গভর্ণরকে দেওয়া হয়েছিল ডেপুটেশনের মাধ্যমে। বহুবিবাহ যাহাতে আইনত নিষিদ্ধ হয়

সে বিষয়ে বহু পত্র বিনিময় হয়েছিল। বাংলাদেশ সরকার ভারত সরকারকে এমন দাবিও জানিয়েছিল সমগ্র ভারতবর্ষে না হলেও বাংলাদেশে এই প্রথা আইন করে বন্ধ করা হোক। ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারকে একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগের পরামর্শ দিলে, একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হল যে কমিটিতে দেশী বিদেশী সকল শ্রেণীর সদস্যরা ছিলেন, এবং বিদ্যাসাগরও ছিলেন সেই কমিটির একজন সভ্য। একমাত্র বিদ্যাসাগরই আইনের দ্বারা বহুবিবাহ বন্ধ হোক বলে চাইতেন, কিন্তু বাকীরা আইনের দ্বারা বন্ধ হোক এটা চাইতেন না। সোমপ্রকাশ পত্রিকার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বিতর্কের সৃষ্টি হয় বহুবিবাহকে কেন্দ্র করে। সোমপ্রকাশ বলেছিল যে, বিদ্যাসাগর যে বহুবিবাহকে শাস্ত্র নিষিদ্ধ বলে প্রতিষ্টিত করতে চাইছেন তাতে কোন লাভ হবে না। তারা আরও বলেন যে শাস্ত্র নিষিদ্ধ শুনলেও যে এদেশের লোক ভয় পাবে বা তার থেকে সরে যাবে তাও কিন্তু নয়। সোমপ্রকাশ পত্রিকা ও বিদ্যাসাগরের মধ্যে বহুবিবাহ নিয়ে যেমন মত বিনিময় হয়েছিল তেমনি সোমপ্রকাশের মাধ্যমে অন্য ব্যক্তির সাথেও বহুবিবাহ নিয়ে বিদ্যাসাগরের তর্ক বিতর্ক হয়েছিল। বহুবিবাহ আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে উঠেছিল এই তর্ক বিতর্কের মাধ্যমে।

কেউ কেউ মনে করত বহুবিবাহ শাস্ত্র সম্মত আবার কেউ কেউ মনে করত তা অশাস্ত্রীয়, কেউ কেউ বহুবিবাহের প্রয়োজনীয়তা বোধ করতেন আবার কেউ কেউ অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন। বিদ্যাসাগরের 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' পুস্তক মানুষের মনে বেশ সারা জাগিয়েছিল। সে সময় পাঁচজন পন্ডিত ব্যক্তি পুস্তকটির সমালোচনা করে পুস্তক রচনা করেছিলেন। বিদ্যাসাগরও কিন্তু চুপ চাপ বসে না থেকে তাদের সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' দ্বিতীয় পুস্তক রচনা করেন।

বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তী অনেকেই বহুবিবাহকে কেন্দ্র করে নানা পুস্তক রচনা করলেও, বিদ্যাসাগরে বহুবিবাহ বিষয়ক পুস্তকই বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। বহুবিবাহ যে শাস্ত্র সম্মত নয়, বিদ্যাসাগর এই কথাই প্রমান করতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন-

> "বিবাহ নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য এই তিন রকমের। পুত্রলাভ ও ধর্মকার্য সম্পাদনের জন্যে গৃহস্থাশ্রমের প্রয়োজন; এজন্য বিবাহ অপরিহার্য। এই

> গৃহস্থাশ্রমের কার্য উদ্‌যাপনের সময় স্ত্রীবিয়োগ ঘটলে পুনরায় বিবাহ করা প্রয়োজন; তবে ঐ বিবাহ স্ত্রী বর্তমানে নয়।”[১৪]

১৭৭৮ সনে তত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে বহুবিবাহের পক্ষে যে আবেদন পত্র পাঠানো হয়েছিল তার বিপক্ষে পাঠানো আবেদন পত্রের আলোচনা করা হয়।

যারা বহুবিবাহকে সমর্থন করতেন তাদের মতে শুধু সৎ পাত্রে কন্যাকে পাত্রস্থ করার জন্যই এক কুলীনের সাথে বহু কন্যার বিবাহ হয়ে থাকে। এই বক্তব্য প্রমান করার জন্য মনুর বচন উদ্ধার করা হয়েছিল। মনু বলেছিলেন-

> “কন্যাকে সৎপাত্রে দান করবার জন্যে পিতামাতা সব সময় সচেষ্ট থাকবে। উৎকৃষ্ট পাত্র পেলে অপ্রাপ্ত বয়স্কা কন্যাকেও সেই পাত্রে সম্প্রদান করা বিধেয়; সৎপাত্র না পাওয়া গেলে অবিবাহিত অবস্থায় কন্যার মৃত্যুও ভাল।”[১৫]

মনুর এই বচন কিন্তু বিরোধীপক্ষকেই পোক্ত করে। কুলীনরা যে সমস্ত পাত্রে কন্যাদান করেন তারা আসলে সৎপাত্রের উপযোগী নন। মনু যে সৎপাত্রের কথা বলেছেন কুলীনরা সে সৎপাত্রের পর্যায়ে পড়ে না।

বহুবিবাহ কেন্দ্রিক আন্দোলন কেবল মাত্র রাজধানীতে সীমাবদ্ধ না থেকে ক্রমশ গোটা দেশেই ছড়িয়ে পড়েছিল। কলকাতা ছাড়াও পূর্ববঙ্গে বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। রাসবিহারী বিদ্যাসাগর প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের কঠোর পরিশ্রমের পরও বহুবিবাহ আইনত নিষিদ্ধ করা যায় নি। কোনো এক সময় আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। এর কারণ হিসেবে বলতে হয় যে দেশের একটি শ্রেণীর শিক্ষিত মানুষের বিশ্বাস ছিল যে বহুবিবাহ রাজ আইনের দ্বারা বন্ধ হওয়ার দরকার নেই, দেশে যদি শিক্ষিতের হার বাড়ানো যায় তবে তা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে। কৌলীন্য ও বহুবিবাহ কেবল মাত্র একটি মাত্র শ্রেণীর সমস্যা থাকার কারণে দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের সহযোগীতা পাওয়া যায় নি। ফলে এই আন্দোলন গতি হারিয়ে এক সময় বন্ধ হয়ে যায়।

কোনো একটি সমাজের যদি উন্নতি সাধন করার কথা ভাবা হয়, তাহলে সমাজে সকল স্তরে মানুষের যেমন শিক্ষাদীক্ষার প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন সহযোগীতা। আমাদের দেশের নারীরা বহু পূর্ব থেকেই অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে আসছিল। নারীর অগ্রগতির কোনো রাস্তাই খোলা ছিল না। কিন্তু সমাজ তখনই উন্নত হয় যখন সেই সমাজের সকল স্তরের মানুষ শিক্ষা দীক্ষায়, মানসিকতায় উন্নত হবে। উনিশ শতকের সমাজ সংস্কারকেরা প্রগতিশীল ও উদারপন্থী মনোভাব নিয়ে নারীর কল্যাণের জন্য বহু চেষ্টা করেছিলেন। যার ফলে নারীদের শিক্ষা দীক্ষা নিয়েও আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। খ্রীষ্টান মিশনারীরাও নারীদের শিক্ষার ব্যাপারে যত্নবান হয়েছিলেন। কিন্তু প্রগতিবাদ বিরোধীরা নারীর শিক্ষাকে কোনো ভাবেই মানতে পারতেন না। নারীকে অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

মদনমোহন তর্কালংকার স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। প্রবন্ধটি ১৭৭২ শকাব্দের আশ্বিন মাসে 'সর্বশুভংকরী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মদনমোহন স্ত্রীশিক্ষা বিরোধী ব্যক্তিদের মত ও যুক্তি সেই প্রবন্ধে তুলে ধরেছিলেন। তাঁদের মতে শিক্ষা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় মানসিকতা বা বুদ্ধি নারীদের নেই। স্ত্রীশিক্ষা দেশের আচার ও শাস্ত্র বিরোধী। লেখাপড়া জানা নারীদের দুঃখ হয়, শিক্ষা লাভ হলে নারীরা মুখরা হবে এবং মা বাবা ও পতিকে মান্যতা দেবে না, শিক্ষা লাভ করলে নারী পাপ ভোগ করবে এবং তাদের বংশেরও পাপ হবে। তাদের মতে নারী অন্তঃপুর বাসিন্দা তাদের শিক্ষার প্রয়োজন নেই। তাদের এই বক্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে মদনমোহন বলেছিলেন যে, প্রকৃতিগত পার্থক্য ছাড়া নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। তিনি বলেন যে স্ত্রীশিক্ষা প্রাচীন কালেও ছিল। শাস্ত্র ঘাটলে দেখা যায় যে স্ত্রীশিক্ষা নিন্দনীয় নয়। শিক্ষা লাভ করলে যে নারী বিধবা হবে তারও কোনো কারন নেই বরং শিক্ষা লাভ করলে নারী সৌভাগ্যশালিনী হবে। শুধু চাকরীর জন্য নয়, আত্মসত্তাকে জাগিয়ে তোলার জন্য স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন।

সে সময় নারী পুরুষের পাঠের বিষয় নিয়েও মতবিরোধ ছিল। এই মতভেদের কারনে 'তত্ববোধিনী' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয় নাম 'প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা'। সে প্রবন্ধে স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছে–

> "স্ত্রী ও পুরুষ জাতির প্রকৃতির বিভিন্নতার নিমিত্ত দুইয়ের পক্ষে এক প্রকার শিক্ষার উপযোগীতা অসম্ভব। স্ত্রী প্রকৃতি স্বভাবতই হৃদয়প্রধান,এবং পুরুষ প্রকৃতি স্বভাবত বুদ্ধিপ্রধান। অতএব তাহাকেই প্রকৃত শিক্ষা বলা যাইতে পারে যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য হৃদয়ের উন্নতি এবং গৌন উদ্দেশ্য বুদ্ধির উন্নতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ., এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য যে শিক্ষা প্রদত্ত হয় তাহা বুদ্ধি প্রধান শিক্ষা, হৃদয় প্রধান শিক্ষা নহে; অতএব ঐ প্রকার শিক্ষা স্ত্রীজাতির পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষা নহে।"[১৬]

স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে নানা আলোচনা সত্বেও সরকারের অবহেলার কারণে সেই শতকে মেয়েদের শিক্ষার কোনো নিয়ম মাফিক ব্যবস্থা গ্রহন করা হয় নি। তাছাড়া বিভিন্ন সামাজিক কুসংস্কারও মেয়েদের শিক্ষার পথে বাধা হয়ে দাড়িয়েছিল। যেমন বাল্যবিবাহ, যে বিবাহের ফলে মেয়েরা শিক্ষা গ্রহনের সময়ই পেত না। আর সর্বমূলে ছিল স্ত্রীশিক্ষা বিরোধী মনোভাব। তবুও বলা যায় যে উনিশ শতকের স্ত্রী শিক্ষা আন্দোলনের জন্য নারীদের কিছুটা হলেও লাভ হয়েছিল।

উনিশ শতকে আরও বিভিন্ন প্রথা রোধ করার জন্য নানা প্রচেষ্টা এবং আন্দোলন, প্রতি-আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল, তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল। যেমন–পণ প্রথা ও কন্যাবিক্রয় প্রথা বিলোপ আন্দোলন, মদ্যপান নিবারণ আন্দোলন, জাতিভেদ প্রথা দূরীকরণ আন্দোলন, হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা সংক্রান্ত আন্দোলন।

আলোচনার শেষ প্রান্তে এসে আমরা বলব যে সমগ্র উনিশ শতক এমন কী বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সময়টাই ছিল একেবারে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ, ভাঙা গড়ার সময়। তাই স্বাভাবিক ভাবে এই সময়টাই তর্ক বিতর্ক হওয়ার উপযুক্ত সময়।

উনিশ শতকের নবজাগরনের ফলে মানুষের মধ্যে আত্মসচেতনতা বোধ জেগে ওঠে। সমাজের কিছু মানুষ প্রত্যাশা করত স্বাধীন ভাবে নিজের মত প্রকাশ করতে। নতুন করে কিছু ভাববার সময় এসে গিয়েছে বলে তারা মনে করত। পুরনোকে আকরে ধরে না থেকে নতুনকে স্বাগত জানানোর পক্ষপাতি ছিলেন তারা। এই রকম কিছু উন্নত চিন্তাধারা

নিয়ে মানুষ নিজের নিজের যুক্তি দিয়ে লেখা লেখি শুরু করেছিলেন। তাই আমরা বলব নবজাগরনের সৃষ্টি বিতর্ক রচনা, তার আবির্ভাব উনিশ শতকে।

যে কোনো একটি চিরাচরিত প্রথা তা ভালোই হোক আর মন্দই হোক তার বিরুদ্ধে কথা বললেইতো যত বিতর্কের সূচনা। উনিশ শতকীয় কালপর্বে যে সব সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে জোরদার বিতর্ক দানা বেধেছিল তার মধ্যে বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা, মদ্যপান হল উল্লেখযোগ্য। বেশীরভাগ বিতর্কগুলোই নারী কেন্দ্রিক। বিদ্যাসাগর রামমোহনের মত প্রগতিশীল ব্যক্তিরা যেমন নারীসমাজকে অন্ধকার থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেছেন তেমনি অপ্রগতিশীলগন তা রোধ করার জন্য মরিয়া চেষ্টা কেরেছে। এই তর্ক বিতর্কের মধ্যদিয়েই ধীর গতিতে হলেও কখনো একক চেষ্টায় কখনো প্রগতিশীল ব্যক্তিদের স্বক্রিয় উদ্যোগে উনিশ শতকীয় নারী সমাজ ক্ষমতার স্বাদ আস্বাদনের প্রয়াস করেছে। ক্ষমতায়ন তো আর একদিনে লাভ করা সম্ভব নয়, লড়াই করেই তা অর্জন করতে হয়। বিতর্কওতো একপ্রকার লড়াই। এ লড়াইয়ে লাঠি বা অস্ত্রের প্রয়োজন হয় না, এ লড়াই বুদ্ধির লড়াই। প্রগতিশীল বনাম অপ্রগতিশীলদের এই লড়াইয়ের মাঝখান থেকে নারীর ক্ষমতায়নের পথ চলা শুরু হয়েছিল উনিশ শতকেই।

তথ্যসূত্র-

1. Dictionary of Literary Terms- Harry Show, page no.294
2. উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা বিতর্ক রচনা, অজয়েন্দ্রনাথ সরকার, পৃষ্ঠা ৩।
3. উনিশশতকের বাঙলার জাগরন তর্ক ও বিতর্ক, নরহরি কবিরাজ, পৃষ্ঠা ১০৩।
4. উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা বিতর্ক রচনা, অজয়েন্দ্রনাথ সরকার, পৃষ্ঠা ৪৯-৫০।
5. ঐ পৃষ্ঠা ২৭৩।
6. ঐ পৃষ্ঠা ২৭৭।
7. ঐ পৃষ্ঠা ২৭৭।
8. বিদ্যাসাগর রচনাবলী, সুবোধ চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা ৫৬৯।
9. উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা বিতর্ক রচনা, অজয়েন্দ্রনাথ সরকার, পৃষ্ঠা ১৪৮।
10. বিদ্যাসাগর রচনাবলী, সুবোধ চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা ৫৭৩।
11. উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা বিতর্ক রচনা, অজয়েন্দ্রনাথ সরকার, পৃষ্ঠা ২৩৯।
12. ঐ পৃষ্ঠা ৯১।
13. ঐ পৃষ্ঠা ৯৫।
14. ঐ পৃষ্ঠা ২০৫।
15. ঐ পৃষ্ঠা ২০৩।
16. ঐ পৃষ্ঠা ৮৮।

****